পুরাতনী

নেতাজীর দুর্গাপূজা

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

এক ভাবুক কিশোরের চোখে দুর্গাপূজা

পনেরো বছরের এক দিব্য কিশোর কটক থেকে মাকে চিঠি লিখছেন মহানবমীর দিন (১৯ অক্টোবর ১৯১২)। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোদালিয়াতে তাঁদের পৈত্রিক বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হয়। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর মা এবং পরিবারের সকলে কোদালিয়ার বাড়িতে গেছেন, কোনও কারণে সেই বছর কিশোরটি তাঁদের সঙ্গে যেতে পারেননি, তিনি কটকের বাড়িতেই রয়ে গেছেন। মনের দুঃখ জানিয়ে তিনি মাকে লিখলেন,

"মা,

আজ নবমী; সুতরাং আপনি এখন দেশে—দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন। এ বৎসর বোধ হয় পূজা বেশি জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল; আর অধিক কি প্রয়োজন? যে-পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে![১] এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশি দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা নানা সাজ-সজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না; এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না। এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি 'শান্তি জলে'র অভাবে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা, অম্বরব্যাপিনী মূর্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।"[২]

চিঠির ভাষাটি লক্ষ করুন। নিজেদের বাড়ির

দুর্গাপূজার একটা নিখুঁত মিনিয়েচার চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সেই বয়সে মাতৃপূজার সঙ্গে দেহে-মনে-প্রাণে কতটা একাত্ম হতে পারলে এমন চিঠি লেখা যায়! আজ একশো দশ বছর পরেও আমরা যেন এই কালজয়ী শব্দরাজির মধ্য দিয়ে আমাদের না-দেখা সেই দুর্গোৎসবের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ পাচ্ছি। অথচ এর মাত্র বছর তিনেক আগে তিনি নিজের মাতৃভাষা বাংলা ভাল করে লিখতে পারতেন না (যদিও তিনি ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন), কারণ তিনি সাহেবি স্কুলে ইংরেজিতে পড়াশোনা করেছেন। পরে যখন দেশীয় স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁর বাংলা ভাষার নমুনা সহপাঠীদের হাস্যোদ্রেক করত। কিন্তু অঘটনপটীয়সী প্রতিভার অধিকারী কিশোরটি অচিরেই সেই ভাষাগত অপটুত্ব কাটিয়ে উঠে বাংলা ভাষায় (সেইসঙ্গে সংস্কৃত ভাষাতেও) সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। মাকে লেখা এই অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিটি তার অন্যতম প্রমাণ। কটকের স্বনামধন্য উকিল জানকীনাথ বসু (১৮৬০-১৯৩৪) এবং প্রভাবতী দেবীর (১৮৬৯-১৯৪৩) ষষ্ঠ পুত্র (নবম সন্তান) এই কিশোর, যাঁর ডাকনাম 'সুবি'। এই মুখচোরা ও লাজুক ছেলেটিই ভবিষ্যতে অনেক অচিন্তনীয় এবং প্রায়-অসম্ভব কাজ করে একক চেষ্টায় প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বারবার হতবিহ্বল, হতমান ও হতবল করে দেবেন, এককভাবে হয়ে দাঁড়াবেন তৎকালীন সম্মিলিত শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদের মহাত্রাস এবং প্রবলতম শত্রু—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-)।

কোদালিয়ার কুলীন কায়স্থ (দক্ষিণরাঢ়ী) বসু পরিবারে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। সেই পরিবারের সন্তান সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই হয়ে উঠেছিলেন মা দুর্গার উপাসক। পিতা ব্রাহ্মভাবাপন্ন (নিরাকারবাদী) হলেও মাতা ছিলেন মা দুর্গা ও মা কালীর ভক্ত। জননীর প্রভাবে বালক সুভাষও হয়ে উঠেছিলেন মা দুর্গা ও মা কালীর ভক্ত। পরে তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঈশ্বরের মাতৃরূপই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। মাতৃভক্তির পুণ্যজাহ্নবী তাঁর অন্তর্গহনে সর্বদাই প্রবহমান ছিল—শতসহস্র কাজের মধ্যে, দুর্গম পথযাত্রায়, রক্তস্নাত রণভূমিতে। তাঁর সেইসব বীরোচিত কাজের মূল প্রেরণা ছিল পরমাশক্তিরূপিণী মা দুর্গা ও মা কালীর আরাধনা। আমরা মায়ের এই বীরোত্তম পুত্র সুভাষচন্দ্রকে দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের দুর্গাপূজার মণ্ডপে—বসু পরিবারের পারিবারিক পূজায়, বিভিন্ন বারোয়ারি পূজায়, ব্রিটিশ সরকারের তৈরি কারাগারের নারকীয় পরিবেশে, এমনকী ভয়ংকর রণক্ষেত্রে।

বিস্ময়ের কথা, সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব জীবনীতেই তাঁর বহির্জীবনের কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনকাহিনি এবং নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে; সেই তুলনায় তাঁর অন্তর্জীবনের এই মাতৃপূজার দিকটি, গভীরতর দিকটি হয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকেছে, অথবা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। আমরা এখানে সেই প্রায়-অনালোচিত বিষয়টির ওপর একটু আলোকপাত করতে চাইছি।

মহাষষ্ঠীর যথাবিহিত বোধন ও অধিবাসের পরে মা দুর্গার পূজা হয় চারদিন ধরে—দেবীপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিথিতে। সুভাষচন্দ্রের জীবনের দুর্গাপূজাতেও এই চারটি 'তিথি' দেখা যায়। প্রত্যেকটি 'তিথি'তে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে মায়ের পূজা করেছেন। এবারে সেই পুণ্যকাহিনিতে প্রবেশ করা যাক।

প্রলয়পয়োধিজলে 'জ্যান্ত দুর্গার পূজা'

কেবল ১৯১২ সালেই নয়, এর দশ বছর পরে আরও একবার তিনি পারিবারিক দুর্গাপূজাতে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর জীবনীতে পাই, ''১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে উত্তরবঙ্গের

জেলাগুলিতে হঠাৎ ভয়াবহ বন্যা হয়। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েন। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস ত্রাণকার্যের জন্যে আবেদন করে। বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। ইংরেজ সরকার তখন নির্বিকার ছিল। প্রথম যে দলটি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে পৌঁছয় তাতে সুভাষচন্দ্রও ছিলেন।... এই বিরাট সেবামূলক কাজে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কংগ্রেস সদস্য ও অন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করার পেছনে তাঁর যে অমানুষিক পরিশ্রম ও ক্লেশ ছিল...” তা আমাদের চিন্তার অতীত। ‘‘আর্তত্রাণ সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র সান্তাহারে বিরাট তাঁবুতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তিনি সব কিছু তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি কাজ তিনি নিজে দেখতেন। নিজের কৈশোর ও ছাত্র জীবনের স্বপ্ন তাঁর কাছে সার্থক হয়ে উঠেছিল।...” সেই বছর ‘‘পারিবারিক দুর্গাপূজায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে জানকীনাথ পুত্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দেশের বাড়িতে পুজোয় যাবার জন্য বলেন।” স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্র ‘‘সুভাষ পিতাকে বলেন, ‘না বাবা। আপনারা সবাই গৃহে মা দুর্গার পূজার জন্য যান। আমি আমার প্রকৃত মা দুর্গাকে অসহায় মানুষদের মধ্যে পূজা করতে যাব।’ ”[৩] এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিপ্লবী সহকর্মী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, ‘‘শ্যামা বাংলার মিষ্টি মধুর রূপই চিরদিন দেখে আসছি কিন্তু সেই প্রথম দেখলাম বাংলার রুদ্রাণী রূপ।”

ভয়াবহ সেই বন্যা। নরেন্দ্রনারায়ণ লিখেছেন, ‘‘কণ্ঠে অভয় বাণী আর বুকে করে অভয়ার (মা দুর্গারই আর একটি নাম!) রূপ সুভাষচন্দ্র দাঁড়ালেন ওদের [হাজার হাজার দুর্গত মানুষের] সম্মুখে।...

‘‘ইংরেজের গোলামী অস্বীকার করবার পর উত্তর-বাংলার আর্তি [আর্ত] সেবার এই অনন্য সাংগঠনিক প্রতিভা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের প্রথম বিজয়-পর্ব। শুধু এদেশের আপামর গণ-জীবনই সেদিন তাঁর এই দেশসেবার অপূর্ব অবদানে বিস্মিত হয়নি,... বিদেশের বহু পর্যবেক্ষক, বিশেষ করে ইংরেজের মুখ থেকেও এই নবীন তাপসের সেবা-ধর্ম বহু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করে ছেড়েছিল।”[৪]

এই অতুলনীয় সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে শুরু হল যুবক সুভাষচন্দ্রের ‘মহাষষ্ঠী’-র মাতৃ-আরাধনা।

এরপরে নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনীর অধিবেশনে (আর্য সমাজ হলে) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে (ডিসেম্বর, ১৯২২) সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে মাতৃবন্দনার যে-অপার্থিব সুর ধ্বনিত হয়েছিল তা কোনও সাধারণ রাজনৈতিক নেতার নিষ্প্রাণ পেশাদারি বক্তৃতা নয়, তা সত্যদ্রষ্টা কবি-দার্শনিকের বাণী, যেন কোনও এক নবীন ঋষির সুগম্ভীর স্বদেশমন্ত্রোচ্চারণ : ‘‘এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ—আজ মা সত্যই বুঝি ডেকেছেন। ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখো, চারিদিকে ধ্বংসের স্তূপীকৃত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। কী বিরাট! কী মহিমময়!

‘‘শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়কুন্তলা নদীমেখলা, নীলাম্বর-পরিধানা বরাভয়বিধায়িনী সর্বাণী, সদা হাস্যময়ী, সেই তো আমার জননী। শারদ জ্যোৎস্নামৌলি মালিনী, শরদিন্দু-নিভাননা, অসুর-দর্প-খর্ব-কারিণী, মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ময়ী আজ আমাদের হৃদয়-পাদপীঠে তাঁর অলক্তরাগরঞ্জিত পা দু-খানি রেখে বলেছেন—মাভৈঃ, জাগৃহি।”[৫]

কারাগারে প্রথম দুর্গাপূজা

পারিবারিক দুর্গাপূজা বা সর্বজনীন (বারোয়ারি) দুর্গাপূজা করা ততটা কঠিন নয়। কিন্তু বিধর্মী ইংরেজ শাসকদের কারাগারে রাজবন্দি হয়ে থাকাকালীন জেলের মধ্যেই দুর্গাপূজার আয়োজন করা কি আদৌ

সম্ভব? ইতিহাস সাক্ষী, পরাধীন ভারতবর্ষে এমন অঘটন সত্যিই ঘটিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র... প্রথমবার রেঙ্গুনে (মান্দালয় জেলে), দ্বিতীয়বার কলকাতার বুকে (প্রেসিডেন্সি জেলে)। কাজটা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না, কিন্তু কোনও প্রশাসনিক বাধা বা সাংগঠনিক সমস্যা তাঁকে হতোদ্যম করতে পারেনি। এই দুঃসাধ্য কাজে তাঁকে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায় কী না ঐতিহাসিকরা ভেবে দেখতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য প্রশাসক (Chief Executive Officer) হিসাবে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত, তৎকালীন কোনও সহিংস বা অহিংস আন্দোলনের সঙ্গেই তখন প্রত্যক্ষত তিনি যুক্ত নন। কিন্তু সন্দেহতাড়িত ইংরেজ সরকার তা মানতে রাজি নয়। একদিন (২৫ অক্টোবর ১৯২৪) ভোরবেলায় তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল কুখ্যাত 'তিন আইন'-এ।[৬] কিছুদিন পরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুদূর বর্মা মুলুকের মান্দালয় জেল নামক পার্থিব নরকে। অথচ ইংরেজ সরকারের হাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রমাণ ছিল না।

মান্দালয় জেল থেকে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে সুভাষচন্দ্র লিখলেন (১৯২৫, তারিখ অজানা), ''আশা করি আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে; এই উৎসবটি হিন্দুরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের সব হিন্দু উদ্‌যাপন করে। সারা বছরের পূজানুষ্ঠানের মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে বড়। এই উৎসবটি পাঁচদিন ধরে চলে, এবং অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম এত ব্যাপক যে আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে।

''এই পূজানুষ্ঠানটি আমরা এখানে (মান্দালয় জেলখানার মধ্যে) পালন করব বলে মনস্থ করেছি, সুতরাং এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে। এই উৎসব খাতে... টাকা প্রয়োজন, সরকারি অনুদান হিসাবে ওই অর্থ আমাদের দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

''... সাধারণ পূজার্চনা করার মতো বাঙালী পুরোহিতও এখানে (মান্দালয়ে) পাওয়া যায় না। দুর্গাপূজা করা বেশ কঠিন কাজ এবং সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই এই পূজা করতে পারেন। সুতরাং এই পূজার জন্যে বাংলাদেশ থেকে একজন পুরোহিত নিয়ে আসা দরকার। অতএব বাংলাদেশ থেকে যথাসময়ে একজন পুরোহিত আনবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে।

আশাকরি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আপনি যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।''[৭]

সরকারি কাজে সব সময়েই (ইংরেজ শাসনেও) আঠারো মাসে বছর! বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে এই চিঠির উত্তর আসবার আগেই দুর্গাপূজা এসে গেল। সুভাষচন্দ্র তখন বাধ্য হয়ে, অনুমতি এবং অর্থের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, অর্থাৎ জেলের সুপার মেজর ফিন্ডলের দ্বারস্থ হলেন। মেজর ফিন্ডলে মানুষটি সহানুভূতিশীল এবং সমদর্শী ছিলেন। তিনি দেখলেন, ভারতের কারাগারে খ্রিস্টান বন্দিরা যখন তাঁদের উৎসব পালন করবার জন্য অনুমতি এবং অর্থ পেয়ে থাকেন, তখন হিন্দু বন্দিদেরও তাঁদের ধর্মীয় উৎসব পালন করবার জন্য অনুমতি এবং অগ্রিম কিছু অর্থসাহায্য দেওয়া যেতে পারে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঘটনোত্তর অনুমোদন (ex post facto sanction) পেতে কোনও প্রশাসনিক সমস্যা হবে না। এই সরল বিশ্বাসে তিনি দুর্গাপূজার জন্য অনুমতি এবং অর্থ (অগ্রিম) দিয়ে দিলেন। সেইমতো মান্দালয় জেলে [প্রথমবার] দুর্গাপূজা হল সুভাষচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে।

শেষ পর্যন্ত মান্দালয় জেলে মায়ের শুভ

পদার্পণ হল! আনন্দসাগরে ভাসতে ভাসতে মায়ের বীরভক্ত সুভাষচন্দ্র তাঁর আর-এক মাকে (দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবী) লিখলেন (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫), ''... আজ মহাষ্টমী। বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতেছি। মা বোধ হয় আমাদের কথা ভোলেন নাই তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জীবতার মধ্যে—পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে কয় বৎসর কাটবে জানি না। তবে মা যদি বৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যান তবে—কারাবাস দুর্ব্বিষহ হইবে না ভরসা করি।...''[৮]

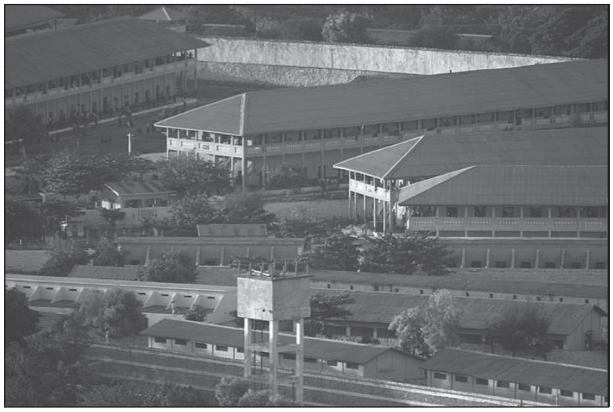
মান্দালয় জেলের একাংশ

কতখানি মাতৃগতপ্রাণ হলে জেলখানায় বন্দি থেকেও এমন আকুতি-মিশ্রিত চিঠি লেখা যায়, তা আমাদের চিন্তার অগোচর!

মান্দালয় জেলে অনুষ্ঠিত এই অভিনব দুর্গাপূজার সংবাদ স্বাভাবিকভাবেই তখনকার বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। বাবা ও দাদার চিঠিতে এইসব খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র যে আনন্দিত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে উদ্বেগ। পূজা সমাপন হওয়ার পর স্বভাবমন্থর সরকারি প্রশাসন-যন্ত্র সচল হল। খবর এল, জেলের বড়কর্তারা সুভাষচন্দ্রের এই কাজকে অনুমোদন দেননি। এই পূজার সঙ্গে 'সুভাষচন্দ্র' নামক বিপজ্জনক ব্যক্তিটির যুক্ত থাকাটাই যে এর একমাত্র কারণ, তা সহজেই বোঝা যায়! শুধু তাই নয়, সুভাষচন্দ্রকে পূজার অনুমতি দেওয়ার অপরাধে মেজর ফিন্ডলেকে প্রশাসনিকভাবে ভর্ৎসনা করা হল এবং সেই সঙ্গে, পূজার জন্য যে-অর্থ (মাত্র পাঁচশো টাকা!) দেওয়া হয়েছিল সেটা অবিলম্বে রাজকোষে জমা দেওয়ার তুঘলকি আদেশ জারি হল। ফলে আবার শুরু হল সংঘাত। 'পূজনীয়া মেজবৌদিদি'কে (বিভাবতী দেবী) সুভাষচন্দ্র লিখলেন (১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫), ''এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়া ঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশী আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি মঁার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।

''...আমি মেজদাদাকে পূর্ব্বে জানিয়েছিলুম যে দুর্গাপূজার খরচের টাকা বোধ হয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলুম যে পাঁচশো টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক—বাকী টাকা আমরা দোব। আমাদের প্রতিশ্রুত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু পাঁচশো টাকার এক পয়সা [বেশী] আমরা দিতে পারব না—এবং দোব না।''[৯]

সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে মান্দালয় জেলে (দুর্গাপূজা এবং পরে সরস্বতীপূজা) করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার পথটা মোটেই নিষ্কণ্টক ছিল না (যার ইঙ্গিত এই চিঠিতে রয়েছে)। শেষ পর্যন্ত, অনিচ্ছুক সরকারের তহবিল থেকে পূজার ওই সামান্য খরচটুকু—যা তাঁদের ন্যায্য অধিকারের মধ্যেই পড়ে—আদায় করবার জন্য তাঁদের অনশন ধর্মঘটের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম (১৯২০-৪২)' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, ''... সরকার যে কেবল ঐ অনুমোদন দান করা থেকে বিরত থাকলেন তা নয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর ফিন্ডলে নিজে দায়িত্ব নিয়ে একাজ করেছেন বলে তাঁকে ভর্ৎসনাও করলেন। ফলে আমরা সরকারকে জানালাম যে তাঁরা যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন, অন্যথায় আমরা অনশন ধর্মঘট চালাতে বাধ্য হব। [সরকারের কাছ থেকে] নেতিবাচক জবাব এলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনশন-ধর্মঘট শুরু করলাম, তৎক্ষণাৎ বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সমস্ত চিঠিপত্রের আদান প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হল। এতৎসত্ত্বেও ফরোয়ার্ড পত্রিকা [দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র] আমাদের এই অনশন ধর্মঘটের খবর এবং সেই সঙ্গে সরকারের কাছে আমরা যে চরমপত্র পাঠিয়েছিলাম তা-ও প্রকাশ করে দিল। প্রায় এই সময়েই ১৯১৯-১৯২১ সালের ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কমিটির কাছে কারাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার লেঃ কর্নেল মালভ্যানি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে নিয়ে তার বদলে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য [তাঁর] উপরওয়ালা অফিসার, বাঙ্গলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স তাঁকে বাধ্য করেছেন। এই সব খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়। সেই সময় দিল্লীতে ভারতীয় আইনসভার অধিবেশনকালে স্বরাজ্যপন্থী এক সদস্য শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী মান্দালয় জেলে অনশন-ধর্মঘটের কারণে সভা মুলতুবী রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই মর্মে লেঃ কর্নেল মালভ্যানির সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কারাবিভাগ রাজবন্দীদের সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করেছিল। (তখন) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েন এবং অনশনকারী রাজবন্দীদের দাবীগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দেন। আইনসভার বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে ফরোয়ার্ড খবর সংগ্রহ করল তা বের করার জন্য জোর তদন্তকার্য শুরু হয়। [ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের—শরৎচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্র—'লোক' থাকতো, তাঁদের মাধ্যমে অনেক গোপন বা 'টপ সিক্রেট' খবর তাঁদের কাছে চলে আসতো সবার অজান্তে] সে যাই হোক, সরকার অবিলম্বে এই আদেশ প্রচার করলেন যে আমরা যে অর্থ ব্যয় করেছি তাঁরা তা মঞ্জুর করবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সুবিধা ও অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। অতএব পনেরো দিন অনশনের পর আমাদের দাবীর জয় হওয়ায় ধর্মঘটের অবসান হল।"[১০]

এই অংশে সুভাষচন্দ্র যে 'চরমপত্র'টির উল্লেখ করেছেন, সেই দীর্ঘ পত্রটির [তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬] রচয়িতা তিনিই; ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতির বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের যে বিপুল পাণ্ডিত্য ছিল তার একটুখানি পরিচয় রয়েছে এই চিঠিতে। উদাহরণ হিসেবে ওই চিঠিটির কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিলাম—''ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের দাবী না মেনে আপনার সরকার ভারতীয়দের

ধর্ম-প্রবণতা এবং তাঁদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে দুঃখজনক অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমরা যারা প্রাচ্যদেশীয়, আমাদের কাছে ধর্ম নিছক সামাজিক সম্মিলন, বুদ্ধিবিলাস বা ছুটির দিনের উৎসব নয়। এটি সপ্রাণ। ধর্ম আমাদের দৈনিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, ধর্ম আমাদের সমগ্র জাতীয় ও ব্যক্তিসত্তায় পরিব্যাপ্ত। ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন, আমরা জাগতিক বস্তুর তুলনায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে বেশি নজর দিই। এর ভিত্তিতেই আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রজার জাত, এবং বহুদিক থেকে আমরা হয়তো ক্রীতদাসের মতো, কিন্তু ব্রিটিশশক্তিকেও ভারতের প্রিয় মূল্যবোধগুলির প্রতি সম্মান জানাতে হবে। ভারতের ইতিহাসের পাতাগুলি সেই সব শহীদদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পূর্ণ, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন। আমাদের দারিদ্র্য ও অধোগতিকে উপেক্ষা করে ভারত আজও বেঁচে আছে। ভারত বেঁচে আছে কারণ তার আত্মা অবিনশ্বর—তার আত্মা অমর—কারণ তার ধর্মবিশ্বাস আছে। আমরা অনেককিছু হারিয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা এখন অতীতকালের বিষয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ চলেছে ধীরগতিতে। কিন্তু এখনও আমাদের ধর্মবিশ্বাস অটুট। আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের আদর্শে ঈশ্বরোপাসনা করতে চাই, পশ্চিমের ধর্মজগতের আওতায় যাওয়ার বদলে আমরা স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকে আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত।

''...একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টানের কাছে হিন্দুমাত্রই হিদেন [heathen মানে, ধর্মহীন, বর্বর, অসভ্য, পৌত্তলিক, অখ্রিস্টান] হতে পারে এবং তার ধর্ম কুসংস্কারের বেশি মর্যাদা পায় না। কিন্তু, আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র পরধর্মসহিষ্ণুই নয়, প্রতিটি ধর্মকেই মর্যাদার আসন দেয়, এবং বিশ্বাস করে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করা। [স্বামীজীর ভাবশিষ্যের যোগ্য উক্তি]

''...আমাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী অসন্তোষের প্রতিবিধানের জন্য আমাদের সামনে যে একমাত্র সম্মানজনক পথ খোলা আছে আমরা সেই পথেই যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, বৃহস্পতিবার থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করছি।

ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।''[১১]

মান্দালয় জেলের অবর্ণনীয় যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতেও সুভাষচন্দ্র মাতৃভাবে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতেন। জেল থেকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়। সংযতবাক্ সুভাষচন্দ্রের এই চিঠিগুলির মূল্য তাই অপরিমেয়। এই ধরনের কিছু চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

তিনি হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে (দেশবন্ধুর জীবনীকার) লিখেছিলেন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬), ''... তন্ত্রের সারকথা শক্তিপূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃষ্টান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে।... বাঙ্গালী যে ভগবানকে ...শুধু ভগবানকে কেন, বাংলাদেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্বজনবিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি (রূপে) কল্পনা করিয়া থাকি...।''[১২]

মান্দালয় জেল থেকে হরিচরণ বাগচীকে (দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির কর্মী) অন্যান্য বিষয়ের

সঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখলেন (সম্ভবত ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে, তারিখ অজানা), ''... কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে, সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।...

''ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী, প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোনও রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে।[১৩] আমাদের চক্ষু [সুভাষচন্দ্র এখানে ভুল করে 'চক্ষু' লিখেছেন মনে হয়, তার বদলে 'নাসিকা' লিখলে বেশি অর্থবহ হত] আছে, তাই ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া মায়ের পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ—রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।''[১৪]

অবশেষে প্রায় তিন বছর পরে, নানা মহলের প্রবল চাপে ইংরেজ সরকার একরকম বাধ্য হয়ে তাঁকে মুক্তি দিল (১৬ মে ১৯২৭)। বিবিধ প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওই মান্দালয় জেলের নারকীয় পরিবেশের মধ্যে তিনি যেভাবে মা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন, তাতে মনে হয় মা প্রসন্না হয়ে তাঁর পূজার্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর জীবনের 'মহাসপ্তমী'-র দুর্গাপূজা শেষ হল।

সর্বজনীন দুর্গাপূজায় সুভাষচন্দ্র

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিনের জন্য শিলং-এ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বাসন্তী দেবীকে (পরলোকগত দেশবন্ধুর পত্নী) বারবার চিঠি লিখে স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য সকাতর আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই সব চিঠিতেও তাঁর মাতৃভাবনায় দেশমাতা এবং জগন্মাতা এক হয়ে গেছেন। এই সময়ে লেখা দুটি চিঠির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

[তারিখ : ১৭ জুলাই ১৯২৭] ''মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি-বিবেচনা থাকবে না—থাকবে শুধু Blind Worship। তাই বুঝি 'মা'-এর সৃষ্টি। ভগবান করুন যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাতৃপূজা করে যেতে পারি।''[১৫]

[তারিখ : ৩০ জুলাই ১৯২৭] ''আমরা যে মা-র মুখপানে এখনও তাকাইয়া আছি, এটা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুন নয়। আত্মবিশ্বাস আমাদের যথেষ্টই আছে—বোধ হয় একটু বেশিই আছে। তবুও আমরা মা-কে চাই কেন? তার কারণ এই যে মা-কে বাদ দিয়া কোনও পূজাই হয় না। আমাদের সমাজের ইতিহাসে যখনই বিপদ-আপদ জুটিয়াছে তখনই মা-র আবাহন আমরা করিয়াছি। আমাদের অন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা লইয়াই মাতৃমূর্তি রচনা করিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' গান লইয়া আমাদের জাতীয় অভিযান শুরু হইয়াছে।''[১৬]

সুভাষচন্দ্রের ধ্যানের দৃষ্টিতে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ কোনও প্রাণহীন জড়সত্তা নয়, আমাদের স্বদেশ দশভুজা মা দুর্গারই ব্যক্তরূপ—'ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে'! সেই মাতৃভাবে পরিপূর্ণ হয়ে, মেদিনীপুর জেলা যুব-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ভবিষ্যৎ ভারতের নির্মাতা যুবসমাজের কাছে ভারতের 'স্বাধীনতার অখণ্ডরূপ' তুলে ধরলেন তিনি। সেই উদ্দীপক ভাষণের (তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৯) শেষে আবেগময় ভাষায় তিনি বলেছিলেন, ''আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না দশভুজারূপে দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ, আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া [আমরা] সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই।''[১৭]

এইসব পূজা এবং ধর্মীয় উৎসবের আর্থসামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি লিখেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'-এ (মূল ইংরেজি গ্রন্থের নাম An Indian Pilgrim) : ''... সুপ্রাচীন কাল থেকে [আমাদের দেশের] প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উৎসবে পরিণত হয়েছে, যাতে সমগ্র সমাজই অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের একটি গ্রামের দুর্গাপূজার কথাই ধরা যাক। পুজোর ধর্মীয় দিকটি যদিও পাঁচদিন মাত্র চলে, কিন্তু এতৎ সংক্রান্ত কাজকর্ম চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। বাস্তবিক পক্ষে, এই সময়ে পুজোর ব্যাপারে গ্রামের প্রত্যেক জাতি বা পেশার লোককে কোনও না কোনও কাজে প্রয়োজন হয়। সুতরাং—পুজো যদিও একটি বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়, সারা গ্রামই কিন্তু ওই উৎসবে যোগদান করে এবং আর্থিক দিক থেকেও পুজোর দ্বারা তারা লাভবান হত, যা সারা গ্রামের লোক উপভোগ করতে পারত। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশ ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ার দরুন [যা স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার নির্দয় শাসন আর নির্মম শোষণের ফলাফল] ও গ্রামগুলি থেকে লোকজন সরে আসায় এইসব ধর্মীয় উৎসব অনেক কমে গেছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একেবারেই লোপ পেয়েছে। এর ফলে গ্রাম্য অর্থনীতিতে টাকাকড়ির লেনদেনে ক্ষতি হয়েছে এবং সামাজিক দিক দিয়ে ইহা জীবনকে করেছে নীরস এবং একঘেয়ে।''[১৮]

সাংবাদিক লেখক প্রণবেশ চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছিলেন, ''দেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার যুবশক্তিকে উদ্দীপিত করার জন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেবী দুর্গার আরাধনাকে দেশজননীর আরাধনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, সর্বজনীন দুর্গাপূজার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে। লোকমান্য তিলক যেমন গণপতি উৎসবকে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রও তেমনি দুর্গোৎসবের মাধ্যমে যুবশক্তিকে স্বদেশমন্ত্রের দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

''...ভারতের মুক্তিসাধনার প্রধান ঋত্বিক স্বামী বিবেকানন্দ দেশজননীকে 'একমাত্র আরাধ্যা' দেবী বলে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য সুভাষ তাঁর আচার্যের নির্দেশকে শিরোধার্য করে সেই 'একমাত্র আরাধ্যা' দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামের বেদিমূলে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। সুতরাং দুর্গাপূজার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র যে তাঁর একমাত্র আরাধ্যা দেশজননীর পূজাই করতে চেয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।''[১৯]

ধূর্ত এবং সদাসতর্ক ইংরেজ শাসকদের কাছে সুভাষচন্দ্রের এই উদ্দেশ্য গোপন ছিল না। প্রণবেশবাবু লিখেছেন, ''১৯২৬ সালে 'যুগান্তর' দলের নেতা অতীন্দ্রনাথ বসু উত্তর কলকাতার সিমলা (স্বামীজীর পাড়া) ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। মহাষ্টমীর দিন এখানে বিরাট অন্নকূট উৎসব হতো। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে (এই) অন্নকূট উৎসবে প্রসাদ পেতে এখানে আসতেন সুভাষচন্দ্র। ফলে ইংরেজ শাসকরা এই পূজাকে নিছক ধর্মীয় উৎসব বলে মেনে নিতে পারেনি। এর মধ্যে তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল। তাই ১৯৩২, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে এই পূজাকে অবৈধ বলে ইংরেজরা ঘোষণা করেছিল। বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গেও জড়িত ছিল স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস। নেতাজী সুভাষচন্দ্র একসময় এই পূজা কমিটির সভাপতি ছিলেন।''[২০]

কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত সর্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, যথা—আদি লেকপল্লী (দক্ষিণ কলকাতা), কলকাতা ৪৭-এর পল্লী এবং উত্তর কলকাতার তিনটি বিখ্যাত পূজা (সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার সার্বজনীন এবং কুমোরটুলি)।[২১] এই বিষয়ে আর একজন গবেষক লিখেছেন, ''শতবর্ষ অতিক্রান্ত বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজো, উত্তর কলকাতার এমনই একটি বাঙালির সাবেক বারোয়ারি দুর্গাপুজো ১৯১৯ সাল থেকে শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র কলকাতার মেয়র থাকাকালেই ১৯৩০-এ এই পূজা বর্তমান জায়গা (য়) উঠে আসে পাকাপাকিভাবে। তিনি যখন এই পুজোর সভাপতি ছিলেন তখন কুটির শিল্পীদের সই করা শংসাপত্র দিতেন।...

''সর্বসাধারণের সঙ্গে মাটিতে বসে কলাপাতায় দুর্গাপূজার ভোগপ্রসাদ গ্রহণের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।... শুধু জনসংযোগ বা জনজাগরণের লক্ষ্যেই নয়, হৃদয়ের টানেই সুভাষচন্দ্র নানা ক্লাব, সমিতির পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

''সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে মধ্যকলকাতার মলঙ্গা লেন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এখানকার প্রতিমার রূপ অকালবোধনে দেবী দুর্গা। বিপ্লবীকুল এখানে যুক্ত থাকতেন। যাঁরা মাতৃ প্রতিমার পায়ে নত হয়ে স্বাধীন ভারত গড়ার শপথ নিতেন। সুভাষচন্দ্র বসু এই পুজোর উদ্‌বোধন করেছিলেন।

''... মধ্য কলকাতার নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে [দুর্গাপূজায়] স্বদেশি যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুক্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র প্রতিবছর এই বাড়ির পুজো দেখতে আসতেন ও প্রসাদ গ্রহণ করতেন।...''[২২]

এছাড়া বারোয়ারি দুর্গাপূজায় সুভাষচন্দ্রের আরও একটি বিশেষ দান আছে। আগে একচালার দুর্গাপ্রতিমা গড়ে পূজা হত। ১৯৩৮ সালে পঞ্চমীর দিন কুমোরটুলি সর্বজনীন পূজামণ্ডপের একচালার দুর্গাপ্রতিমাটি কীভাবে যেন আগুন লেগে পুড়ে গেল। উদ্যোক্তারা মহা বিপদে পড়লেন, কারণ পরের দিনই মহাষষ্ঠী! সেই বছর কি তাহলে মায়ের পূজা হবে না? তাঁরা ছুটে গেলেন তাঁদের পূজা কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কাছে (ঘটনাচক্রে তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও সভাপতি)। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, হালের কাছে সুভাষ আছে—করবে তরী পার! সুভাষচন্দ্র ছুটলেন স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে।

অনুরোধ করলেন, একরাত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে দিতে হবে। স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না গোপেশ্বরবাবু। কিন্তু বললেন, এত কম সময়ের মধ্যে তিনি একচালায় পাঁচটি প্রতিমা নির্মাণ করতে পারবেন না। তখন সুভাষচন্দ্রে পরিকল্পনামতো তিনি নিজে কেবল মা দুর্গার প্রতিমাটি (সিংহ ও মহিষাসুর সহ) তৈরি করে দিলেন। বাকি চারটি স-বাহন প্রতিমা (গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক) তৈরি করে দিলেন তাঁর চারজন সুদক্ষ সহকারী। এইভাবে রাতারাতি নতুনভাবে পাঁচচালার ঠাকুর তৈরি হয়ে গেল এবং পরদিন যথাবিধি পূজা শুরু হয়ে গেল। আজ অধিকাংশ পূজামণ্ডপে পাঁচচালার ঠাকুর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, আমরা কি জানি যে সুভাষচন্দ্রই তার আদি পরিকল্পক?

পরের বছর, গোয়াবাগান পূজা প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'দেবী দুর্গার আরাধনার তাৎপর্য' বর্ণনা করে সুভাষচন্দ্র একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন (১৮ অক্টোবর ১৯৩৯)। সেই ভাষণে সুভাষচন্দ্রের সুবিশাল ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা মা দুর্গা, ভারতবর্ষ, জাতীয় পতাকা, পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা—সব একাকার :

''... দেবী দুর্গার আরাধনার অর্থ বিশ্বজননীর আরাধনা। দেবী দুর্গা ও মাতৃভূমির মধ্যে বহু পরিমাণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বিদ্যমান। কাজেই ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে দেবী দুর্গার উপাসনা আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।... দেবী দুর্গা, ধরিত্রী মাতারই বহিঃপ্রকাশ। দেবী দুর্গা, শক্তি ও সামর্থ্যের স্থায়ী উৎস। সুতরাং আমরা মরণশীল ব্যক্তিরা যখন তাঁহার উপাসনা করি তখন আমরা নিজেদের মধ্যেকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে চাই।...

''দেবী দুর্গার উপাসকগণকে পুরাপুরি স্বদেশী হইতে হইবে। স্বদেশীয় সেবা করার অর্থই দেশমাতৃকার সেবা করা।''[২৩]

এইভাবে, অসংখ্য প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন স্থানের দুর্গোৎসবে (এবং অবশ্যই, কালীপূজাতে) সোৎসাহে যোগ দিতেন। এই পর্যায়টিকে তাঁর জীবনের 'মহাষ্টমী'র দুর্গাপূজা বলা যেতে পারে।

কারাগারে দ্বিতীয় দুর্গাপূজা

'মহাষ্টমী'র পূজা শেষ হয়েছে, এবারে শুরু হবে তাঁর বিশেষ 'মহানবমী'-র পূজা। এই দুই তিথির সন্ধিক্ষণে করতে হবে সন্ধিপূজা, শাস্ত্রের তাই বিধান। সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজস্ব 'সন্ধিপূজা' করলেন কারান্তরালে।

ইউরোপে তখন শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে)। সুভাষচন্দ্র সক্রিয় হয়ে উঠলেন, যুদ্ধ-জর্জরিত ব্রিটিশ সরকারকে মোক্ষম চাপ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়ার সুবর্ণসুযোগ এসেছে আবার! এইদিকে লক্ষ রেখে তাঁর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে গোপনে গোপনে বিপ্লববাদী কাজকর্মও চলতে লাগল। বলাবাহুল্য, সেসব আগ্নেয় কাজকর্ম ইংরেজ সরকারের অগোচর ছিল না, কারণ আমাদের দেশে বিশ্বাসহন্তা 'মীরজাফর'-দের অভাব হয়নি কখনও। ফলে সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই ঘোর বিপজ্জনক শত্রুটিকে অবিলম্বে কোনও রকম নিয়ম-কানুনের পরোয়া না করে একটা নামমাত্র পরোয়ানায় (warrant), বিনা প্রমাণে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে দিল (২ জুলাই ১৯৪০)। তবে এবার আর তুঘলকি 'তিন আইন'-এ নয়, অপেক্ষাকৃত ভদ্রস্থ 'ভারতরক্ষা আইন'-এ (Defence of India Act, Section 129) তাঁকে গ্রেফতার করা হল। তাঁর স্থান হল কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। এই তাঁর শেষ কারাবাস।

সেখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আরও অনেক রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন। তাঁদের অশেষ সৌভাগ্য, তাঁরা স্বচক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই মাতৃপূজা দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁদের মধ্যে দুজন এই দুর্গাপূজার বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছিলেন। এই দুই বরণীয় বিপ্লবীর নাম—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এবং রসময় শূর। প্রথমে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি। উল্লেখ্য, তখনও সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' নামে বিশ্ববিখ্যাত হননি, তাই ইতিহাস-সচেতন নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে 'নেতাজী'র পরিবর্তে 'নেতা' বলে উল্লেখ করেছেন।

''...মেজর পাটনি। কারাধ্যক্ষ এসে পড়েছেন। দুর্গোৎসব আসন্ন। নেতা জেল কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নেই তাঁর (দুর্গাপূজা করার) সংকল্পের কথা জানিয়েছেন। পাটনি এসেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে।

''বাইরে থেকে পুরোহিত, তন্ত্রধারক, প্রতিমা আর পুজোর উপকরণ আনাতে হবে। যদি কেউ বাইরে থেকে ভোগের বা পুজোর জন্য কিছু পাঠায়, তাও নিতে হবে। এর সব কথা নেতা [জেল কর্তৃপক্ষকে] জানিয়েছিলেন।

''ওদের আপত্তি নেই বেশির ভাগ ব্যাপারেই। আপত্তি করবার উপায়ই বা কি ছিল? একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা এই লোকটি ওদের অজানা নন। মান্দালয়ের কথাও [ওদের] মনে আছে বিলক্ষণ। পুজো নিয়ে শেষে প্রায়োপবেশন। তারপর সরকারের নতি স্বীকার। এইসব মনে করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পাটনির হাতে সব ভার ছেড়ে দিয়েছে। এখানেই পাটনির চিন্তা। নেতার তুষ্টি আর কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি এক কথা নয়। দ্বন্দ্ব বেধে যাবে না তো?

[ইতিহাসের কী অদ্ভুত পরিহাস! ১৯২৫ সালে মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্রকে দুর্গাপূজা করবার জন্য অনুমতি ও অর্থ দেওয়ার অপরাধে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর ফিন্ডলেকে সরকার ভর্ৎসনা করেছিলেন। আর এখন, ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে সুভাষচন্দ্রের দুর্গাপূজার দায়দায়িত্ব সব মেজর পাটনির হাতে ছেড়ে দিলেন মহামান্য সরকার বাহাদুর। ১৯২৫ আর ১৯৪০—মাত্র পনেরো বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ সিংহের কী অপূর্ব পরিবর্তন! সত্যিই, ইংরেজ সরীখা দাতা নেহি, লট্ঠা বগর দেতা নেহি! প্রবল ইংরেজদের এই দুর্বলতাটা তিনি ভালই জানতেন। তাই মহাবীর সুভাষচন্দ্র সর্বদাই ইংরেজ সরকারের ওপরে সোজাসুজি বলপ্রয়োগের নীতি নিয়েছিলেন।]

''ঢাক, বড় ঘণ্টা, কাঁসর, পুজোর অঙ্গ। হিন্দু মাত্রেরই পুজোয় যোগদান-আকাঙ্ক্ষা মজ্জাগত এবং স্বাভাবিক। নেতার দাবী, সকল হিন্দুকে পুজোর অংশ নিতে অনুমতি দিতে হবে। সবাই,—অবশ্য যাদের ইচ্ছে হবে অঞ্জলি দেবে। প্রসাদ নেবে। আরতি দেখবে। [সুভাষচন্দ্রের মাতৃ-আরাধনায় সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার—''আয় অশুচি, আয় রে পতিত, এবার মায়ের পূজা হবে।"]

''আর কিছুতেই আপত্তি উঠবে না। কিন্তু জেলের মধ্যে অন্তত গোটা পাঁচেক ঢাক যদি এক সঙ্গে বেজে ওঠে, সে কী ভয়ানক ব্যাপার ঘটবে। পাটনি ভেবে অস্থির। আর ওই বড় ঘণ্টা। ওরই শব্দ প্রহরে প্রহরে সময় জানিয়ে দেয়।... ওরই আকস্মিক আর অনবরত ধ্বনি জানিয়ে দেয় বিপদ-আপদের বার্তা। যার নাম জেল পরিভাষায় পাগলা ঘণ্টি। [পূজার সময় ঘণ্টা বাজালে] যদি আবার একটা ফ্যাসাদ বেধে ওঠে।"[২৪]

খুঁটিনাটি বিষয়ে এতসব আলোচনা করবার পরেও কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে দুর্গাপূজার অনুমতি দিতে টালবাহানা করছিলেন। এর কারণটা সহজবোধ্য—এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কালহরণ করতে পারলেই মাতৃপূজার দিনগুলো পার হয়ে যাবে, তখন আর অনুমতির দরকারই হবে না! ব্রিটিশ সরকারের এইসব আমলাতান্ত্রিক শয়তানির

সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ভালভাবেই পরিচিত। বিরক্ত হয়ে তিনি জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কড়া পত্রাঘাত করলেন (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০)। প্রশাসনিক সৌজন্য মেনে যথেষ্ট সংযত ভাষায় লেখা হলেও চিঠিটি কিন্তু খাঁটি সুভাষচন্দ্রীয়! তার মধ্যে কিছুটা ধিক্কার, সূক্ষ্ম বিদ্রূপ আর প্রচ্ছন্ন সতর্কীকরণ ছিলই, আর ছিল পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের (মা দুর্গার বাহন!) চাপা গর্জন। তিনি সোজাসুজি জানালেন :

''প্রিয় মহাশয়,

দুর্গাপূজা সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং নিষেধাদির বিষয়ে ডেপুটি জেলরের নোট আমি দেখেছি। দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। দুর্গাপূজার বিষয়ে যেসব ছাড় তা দেওয়া হয়েছিল ১৯২৬ সালে মান্দালয় জেলে বাঙালি রাজবন্দিদের অনশনের পরে। সে সময়ে আমাদের পূজা করবার জন্য সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং সরকার একটি পূজা-ভাতাও দিয়েছিল, স্ব-আয়োজিত একটি মাত্র সংযম আমরা পালন করেছিলাম। যদিও আমাদের সংগীতবাদ্যের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, আমরা এ বিষয়ে সতর্ক ছিলাম যাতে যথাসম্ভব কম আওয়াজ করা হয়।

দুর্গাপূজা বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

(১) এটি দেশের এই অঞ্চলে [বঙ্গদেশে] হিন্দুদের বৃহত্তম জাতীয় উৎসব।

(২) এটি সম্মিলিত পূজা, সেই কারণে একে শুধু পূজা নয়, উৎসবও বলা হয়ে থাকে।

(৩) দুর্গাপূজার জন্য তিনজন পুরোহিত প্রয়োজন হয় তার মধ্যে একজন চণ্ডীপাঠের জন্য। দুজনের কম দিয়ে কাজ চালানো শারীরিকভাবেই অসম্ভব এবং দুজনকে দিয়ে করাতে গেলেও একজন পুরোহিতের ওপর চণ্ডীপাঠের দায়িত্ব চাপাতে হয়। প্রায়ই তাঁরা তাতে রাজি হন না। কেননা তাতে বড় বেশি চাপ পড়ে।

(৪) পূজার সময়ে নির্ঘণ্ট ঠিক হয় জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী। যেমন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সন্ধিপূজা তার অনুষ্ঠান হয় অষ্টমী তিথিতে, প্রায় প্রায়ই পূজার লগ্ন আসে গভীর রাত্রে (এ বছর সন্ধিপূজা কোন সময় হবে, আমি জানি না)।

জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা অনায়াসে সম্ভব হতে পারে একমাত্র যদি নিম্নলিখিত ছাড়গুলি দেওয়া হয়।

(১) যেহেতু দুর্গাপূজা সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যে-সব হিন্দু কয়েদি চায় তাদের সকলকেই তাতে যোগদান করতে দেওয়া উচিত। এখানে বলা দরকার যে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মুসলিম কয়েদিদের ঈদের সময় এবং ক্রিশ্চান কয়েদিদেরও ক্রিশ্চান উৎসবের সময়ে সে রকম সুযোগ দেওয়া হয়। যাই হোক সমস্ত হিন্দু কয়েদিদের যোগদান করতে না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। [সুচতুর ব্রিটিশ সরকার তাদের কুখ্যাত 'ভাগ করে ভোগ করো' (Divide and Rule) নীতি অনুসারে পরাধীন ভারতবর্ষে এই ধর্মীয় বিভাজনটা সর্বত্রই খোলাখুলিভাবে করত, হিন্দুদের তুলনায় অন্যান্য আব্রাহামিক ধর্মের মানুষরা তাদের কাছে বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতেন। সেই অশোভন পক্ষপাতিত্বের কথাটা কারা-কর্তৃপক্ষকে তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি হিন্দু কয়েদিদের জন্যেও ওই একই সুযোগ দাবি করলেন।]

(২) অন্তত দুজন পুরোহিত থাকতে দেওয়া উচিত।

(৩) তাঁদেরকে পঞ্জিকার গণনা অনুযায়ী সময়ে পূজা করতে দেওয়া উচিত, সে সময় যখনই হোক।

(৪) বাজনা বাদ্য যতটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন, তার অনুমতি দেওয়া উচিত। বিশেষ করে আরতির সময়ে বাজনা অপরিহার্য। (আমাদের অবস্থানগত প্রশ্ন, যা নিয়ে এখন বিচার-বিবেচনা চলছে, তার

সঙ্গে পূজা ভাতার বিষয়েও বিবেচনা করা উচিত।)

''এই ছাড় যদি না দেওয়া হয়, কার্যত তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে সরকার জেলখানায় পূজা করতে দেয় না। এর ফলে ১৯২৬-এর পনেরো দিন অনশন ধর্মঘটের কষ্ট স্বীকার করে আমরা যে সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করেছি অযৌক্তিকভাবে তা নাকচ করা হল। এর আরও অর্থ হবে, [তদানীন্তন] আমলাতন্ত্র [সেদিন] যেসব সুযোগসুবিধা দিয়েছিল [আজকের] জনপ্রিয় সরকার তা ফিরিয়ে নিল।

''[এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে] সে পরিস্থিতির পরিণতি স্বাভাবিক ভাষায় আমাদের পক্ষে গুরুতর হবে। [এই কথাটার সরলার্থ, এর পরিণতি আপনাদের পক্ষেও কিন্তু কম গুরুতর হবে না!] দয়া করে আপনি ব্যাপারটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করবেন এবং প্রয়োজন হলে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।''[২৫]

দেখা যাচ্ছে, সুভাষচন্দ্র তাঁর মূল দাবি থেকে একচুলও সরছেন না, মাতৃপূজায় কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি রাখবেন না। অদম্য সুভাষচন্দ্রের এই কঠিন চিঠিতে কাজ হয়েছিল, কারা-কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য, ওই আওয়াজ-সমস্যার যে কী সমাধান হয়েছিল, তা আমরা জানি না (নরেন্দ্রনারায়ণও জানাননি)। জেলখানার মধ্যে ঢাক-ঘণ্টা বাজাবার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের জেল কোডের বইতে কী লেখা ছিল তাও আমরা জানি না। কিন্তু স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জেলখানার মধ্যেই দুর্গাপূজা যখন হয়েছিল, তখন এটা তো আমরা ধরে নিতেই পারি যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনও একটা অভিনব সমাধানসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন (যার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন চিঠির মধ্যাংশে) যাতে শব্দসমস্যার বিষহীন হেলে সাপটাও মরেছিল, আবার জেল কোডের বিধানের শক্ত লাঠিটাও ভাঙেনি! অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে শাঁখ, ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা সবই বিধিমতো বেজেছিল, আর জেলের কর্তৃপক্ষও তখন বোধকরি মনে মনে সুভাষচন্দ্রের আর হিদেনদের মুণ্ডপাত করতে করতে কিছুক্ষণের জন্য দুকানে তুলো গুঁজে বসেছিলেন।

কিন্তু, হায়! শব্দের সঙ্গে অর্থের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক! তাই, জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা করতে গেলে শব্দসমস্যার সঙ্গে সঙ্গে অর্থসমস্যার সমাধানও করতে হবে। আবার নরেন্দ্রনারায়ণ-প্রদত্ত বর্ণনায় ফেরা যাক : ''আমরা দুজন সুভাষচন্দ্র এবং নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ছাড়াও তখন রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন মহলে তারা থাকে। সবাইকে অন্তত পুজো আর প্রসাদ নেওয়ার সময় একসঙ্গে থাকতে দিতেই হবে। তাছাড়া অন্যান্য কয়েদী। তার সংখ্যাও হাজার দুয়েকের কাছাকাছি। সমস্যা সামান্য নয়।

''নেতাকে আরেকটু ভেবে দেখবার অনুরোধ জানিয়ে পাটনি বিদায় নিলেন। আরম্ভ হল আমাদের পরামর্শ। [সবচেয়ে] বড় সমস্যা হল অর্থ।

''নেতার খাজাঞ্চি মেজ বৌদিদি [বিভাবতী দেবী] কলকাতায় নেই। আর কার কাছেই বা [টাকা] চাইবেন। এক রয়েছেন তাঁর মা [প্রভাবতী দেবী]। কিন্তু তাঁর [আর্থিক] অবস্থা না জেনে [টাকা] চাইলে তিনি হয়তো অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়বেন।

''অন্তত আটকবন্দীরা যদি স্বেচ্ছায় কিছু কিছু দেয়, খানিকটা সুরাহা যে হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু [তাদের কাছ থেকে টাকা নিতে] নেতা নারাজ।

''অনেক চিন্তার পর পথ ও পাথেয় দুই-ই মিলল। [ভ্রাতুষ্পুত্রী] ইলার কাছে একদা নেতা নাকি শ তিনেক টাকা রেখেছিলেন। সেই কথাটা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেছে। আর ভাবনা নেই। এতবড় মোটা টাকার অঙ্ক। নেতা খুশিতে ঝলমল করে ওঠেন।

''কিন্তু নমো নমো করেও হাজার দুয়েক

কয়েদীকে একদিনও যদি প্রসাদ দিতে হয়, তাতেই-যে কমপক্ষে পাঁচশো টাকা চাই। আবার দুশ্চিন্তা আসে ভিড় করে।"

[প্রয়োজনীয় বাকি অর্থের সংকুলান কীভাবে হয়েছিল, সেটা লেখক জানাননি। এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছেন সুভাষচন্দ্রের সহবন্দি বিপ্লবী রসময় শূর মহাশয়। তিনি কী লিখেছেন তা আমরা একটু পরেই দেখব।]

প্রেসিডেন্সি জেল

"নাম-করা কয়েকটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে [আবেদন] জানানো হল। অন্য কিছু নয়, কিছু বোঁদে। অন্তত হাত ভরে যদি সবাইকে একদিনও বোঁদে দেওয়া যায়,—তাতেই ওরা খুশিতে উপচে পড়বে। ওতো শুধু বোঁদে নয়, ও যে মায়ের প্রসাদ।

"কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে মহাপূজা শুরু হয়ে গেল।"[২৬]

পূজার বিবরণ অতি হৃদয়গ্রাহী :

"প্রতিমা এল। বোধন হল।

"মহা সপ্তমী। প্রথম যে মহলে আমরা ছিলাম, সে মহলে পুজোর স্থান হয়েছে। সাজানো হয়েছে মণ্ডপ। দেবীর প্রতিমা এসে গেছে। এসেছে সব রাজবন্দীরা।... পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করছিলেন। আমিও চণ্ডী খুলে বসলাম।... একঘণ্টা কাটিয়ে নেতা এলেন। আমার পাশেই বসে পড়লেন। খুলে নিলেন চণ্ডী। খুব ছোট আকার। একটা নস্যির ডিবের মতো।

"আড়চোখে তাকালাম। গম্ভীর মুখ। ভাবান্তর নেই কোনও। একমনে চণ্ডী পড়ে চলেছেন।...

"স্থির হয়েছিল মহাষ্টমীর দিন একসঙ্গে সবাই-এর খাওয়া হবে। আর প্রসাদ বিতরণ হবে ওই দিনই।...

"মহাষ্টমী। ঘুম ভেঙে যেতেই কানে এল প্রভাতী ঢাকের বাজনা। ঘুম ভাঙানো বাজনা। নেতাও উঠেছেন। স্নানের ঘরে গেছেন।

"বারান্দায় টেবলের ওপর একখানা অ্যালুমিনিয়মের থালায় একরাশ শিউলি ফুল। মৃদু গন্ধ। কেউ দিয়ে গেছে।...

"নেতা বেরিয়ে এলেন। সদ্য-স্নাত। খালি গা। জলের কণা গায়ে। পরনে গরদের ধুতি। ফুলের থালাটা দুহাতে নিলেন। ফুলের দিকে চেয়ে বললেন : 'শিউলি শরতের দূত।'

" 'সঙ্গে ওর সখীও আছে।' বললাম আমি।

" 'কে?'

" 'অতসী।'

" 'হ্যাঁ। অতসীপুষ্পবর্ণাভা,—দেবীর রূপ।'

"প্রসাদ দেওয়া হল সবাইকে। যে এল তাকেই। মায় চীনাদেরও। এক সঙ্গে খাওয়া হল।

"[এইভাবে] কারাগারের দুর্গোৎসব সাঙ্গ হল। বিজয়ার প্রতিমা আমরা গেটে পৌঁছে দিলাম। বাইরে অপেক্ষমাণ জনতা প্রতিমা নিয়ে গেল। [জেলের দরজার] শিকের ফাঁকে নিবদ্ধ হয়ে রইল জনতার উৎসুক দৃষ্টি। একটুক্ষণের জন্য তাদের প্রিয় নেতাকে দেখবার আশায়।"[২৭]

দুর্গাপূজার পরেই সেই একই পূজামণ্ডপে 'কোজাগরী' পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মীর পূজা করবার প্রথা

আছে। সুভাষচন্দ্র অবশ্য জেলের মধ্যে লক্ষ্মীপূজা করেননি। তিনি সেই রাত্রে তাঁর বিপ্লবী সহবন্দিদের নিজের খরচে লুচি-মাংস খাইয়েছিলেন—এমন কথা নরেন্দ্রনারায়ণ জানিয়েছেন।

এই পূজার আর-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণের কিছুটা অংশ উপস্থিত করছি। তিনি হচ্ছেন, বরেণ্য বিপ্লবীত্রয়ী বিনয়কৃষ্ণ বসু, সুধীর (বাদল) গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের (বিনয়-বাদল-দীনেশ) সহবিপ্লবী রসময় শূর (১৯০১-১৯৮১)। তিনি লিখেছেন, ''১৯৩৯ সন সেটা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে সুভাষচন্দ্র বিতাড়িত হলেন কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে। বিশেষ পদ থেকে ছাড়া পেয়ে যেন তিনি নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়লেন দেশের বুকে।... সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেনাপতি এ-সময়ে Holwell monument আন্দোলন শুরু করলেন এবং [ব্রিটিশ] সরকারের বিলম্ব হল না এই দুর্ধর্ষতম ব্যক্তিটিকে কারান্তরালে পাঠাতে। [ডালহৌসি স্কোয়ারে—যা বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ—বিভেদকামী ইংরেজ সরকার 'অন্ধকূপ হত্যা'-র মতো একটা ডাহা মিথ্যাকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে যে-কুখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভটি (Holwell monument) নির্মাণ করেছিল, সুভাষচন্দ্র সেটি ভাঙবার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন।]

''প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি যখন অবরুদ্ধ তখন শারদীয়া পূজা সমাগত [১৯৪০ সাল]। সুভাষচন্দ্র সংকল্প করলেন তিনি দুর্গাপূজা করবেন জেলের অভ্যন্তরে। সুভাষের মাতৃপূজার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন সরকার। কারাগারের প্রাচীর অতিক্রম করে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। মায়ের পূজার উপকরণ নিমেষে এসে গেল সহর কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে। ফুল বিক্রেতা ফুল দেবেন। অন্যান্য উপকরণও আসবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। প্রতিমা আসবে কুমারটুলি থেকে।...

''মহাসমারোহে পূজার আয়োজন হল। ষষ্ঠীর দিনে ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল এল। রাশি রাশি ফল। পূজার বিভিন্ন উপকরণও এসে গেল। গোনাগুনতি নেই। প্রয়োজনের হিসাব নেই।... একান্ত নিষ্ঠায় পূজা শুরু হল পুরোহিত [ও] তন্ত্রধারক নিয়ে। পূজার কয়েকটা দিন পূজায় যোগদান করার সুযোগ পেলাম আমরা। সুভাষচন্দ্রকে তখন দেখেছি মাতৃপূজায় ভক্ত সন্তান। পরনে তাঁর গরদ বস্ত্র, সদ্যস্নাত-শুচি-শান্ত-তন্ময় মূর্তি; ভক্তি শ্রদ্ধা উপচে পড়ছে চোখে মুখে। কখনও পূজার তদারক করছেন। কখনও সমাহিত চিত্তে মাকে দেখছেন। তাঁর এ-রূপ আমার কাছে নূতন। অপরূপ।''[২৮]

কারাগারে মাতৃপূজার এই ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্র কিন্তু নিজের জীবনব্রত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তাই সদাসতর্ক কারা-কর্তৃপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তিনি গোপনে গোপনে তাঁর আসল কাজ করে যাচ্ছিলেন। তখন ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, প্রবল পরাক্রান্ত জার্মান সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে ব্রিটিশ বাহিনী পর্যুদস্ত। তাদের মনোবল ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। এই সুযোগটাই নিতে চেয়েছিলেন নেতাজী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন ভারতবর্ষের সামনে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। তদানীন্তন অহিংসাপন্থী দেশনেতাদের চরম অদূরদর্শিতায় সেই সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের সামনে আবার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে! তাই তিনি তখন দেশের বাইরে গিয়ে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করবার এক সুবিশাল ও দুঃসাহসী পরিকল্পনা করছেন, সেই বাহিনী নিয়ে তিনি ব্রিটিশবাহিনীকে আক্রমণ করবেন। তিনি যখন দেশের বাইরে থেকে সসৈন্যে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করবেন, তখন যদি বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি একযোগে দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করে, তাহলে ঘরে-বাইরে আক্রান্ত হয়ে রণক্লান্ত ব্রিটিশবাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তখন অনিবার্য। এটাই ছিল নেতাজীর স্ট্র্যাটেজি।

এর কিছুদিন পর নানারকম চাপের মধ্যে পড়ে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল (৫ ডিসেম্বর ১৯৪০), শর্ত রইল যে তাঁকে গৃহবন্দি থাকতে হবে। কিন্তু তাঁকে বেশিদিন ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িতে বন্দি করে রাখতে পারল না ব্রিটিশ সরকার। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে ভারত ছেড়ে চলে গেলেন (১৬ জানুয়ারি ১৯৪১ মধ্যরাত্রে)। এরপরে আর কোনওদিন, কোনও দুর্গাপূজার মণ্ডপে প্রকাশ্যে তাঁর জ্যোতির্ময় উপস্থিতি দেখা যাবে না। বলা যেতে পারে, প্রেসিডেন্সি জেলের ওই দুর্গাপূজার মাধ্যমে তিনি তাঁর সহবন্দিদের ও দেশবাসীদের চিরবিদায় জানালেন।

'নবম্যাং পূজয়েদ্‌দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'

এইভাবে প্রেসিডেন্সি জেলে সুভাষচন্দ্রের জীবনে মাতৃ-আরাধনার 'সন্ধিপূজা' সমাপ্ত হল। মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে হয় সন্ধিপূজা। পুরাণ অনুসারে এই সময়ে মহাদেবী চামুণ্ডা-রূপ ধারণ করে চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই রণদুর্মদ অসুরকে বধ করেছিলেন। সেই দেবী চামুণ্ডার মহাশক্তি এবার ক্রিয়াশীল হবে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। চণ্ডমুণ্ডের বদলে তিনি পরাস্ত করবেন যৌথশক্তির (Allied Power) দুই পরাক্রান্ত বাহিনীকে—ইংরেজ ও আমেরিকা। সেই সঙ্গে, সুভাষচন্দ্র থেকে 'নেতাজী' হওয়ার সন্ধিক্ষণও সমাগত।[২৯]

তার পরে তাঁর নবমী তিথির মাতৃ-আরাধনা শুরু হবে অন্যত্র। নিরাপদ পারিবারিক পূজার আনন্দময় অঙ্গনে নয়, সর্বজনীন পূজার উৎসবমুখর মণ্ডপে নয়, কারাগারের নিরানন্দময় নরকেও নয়। এবার মায়ের পূজা হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভয়ংকর রণাঙ্গনে। নবমী তিথিতে পশুবলির বিধান দিয়েছেন শাস্ত্রকারগণ। স্বামীজীও স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করেছেন, ''নবম্যাং পূজয়েদ্‌ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।'' মায়ের সামনে বলি দিয়ে সেই বলির রক্তে মাটি ভিজিয়ে কাদা-কাদা করে পূজা করলে তবে হয়তো রুধিরপ্রিয়া মায়ের কৃপা হবে। তা বলিই যদি দিতে হয়, তাহলে নিরীহ অবলা পশুকে বলি দিয়ে কী হবে? মায়ের মহাপূজায় বলি দিতে হবে নিজেকে, নিঃশেষে, কারণ তাঁর কানে ধ্বনিত হয়ে চলেছে তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা বীরসন্ন্যাসীর বজ্রবাণী : ''... ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত...।''

নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীর সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার। ১৯৪৪ সালের মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কোহিমা এবং ইমফল ফ্রন্টে তাঁরা নেতাজীর নেতৃত্বে সরাসরি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছাব্বিশ হাজার বীর সেনা সম্মুখসমরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এইভাবেই তাঁরা ভারতবর্ষের পবিত্র মাটিতে নিজেদের বুকের উষ্ণ রুধির ঢেলে 'রুধিরকর্দমম্' করে মায়ের পূজা করেছিলেন।

সেই অভিনব 'মহানবমী' পূজার মহান ঋত্বিকের নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

বিসর্জনের বিষণ্ণ সুর বাজল বিজয়ায়

নেতাজীর সঙ্গে ডা. পবিত্রমোহন রায়ের (নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিসের উচ্চপদস্থ অফিসার) শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল মালয়ের পেনাং শহরে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)। তাঁকে তিনি এমন একটা বিপজ্জনক মিশনে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন, যার পদে পদে প্রাণসংশয় হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তাঁদের সেই নৈশ আলোচনা চলেছিল রাত একটা থেকে দুটো পর্যন্ত, যার সারাংশ পরে প্রকাশ

করেছিলেন ডা. রায়। এই বিবরণটি নানা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃসাধক নেতাজীর সেইসব অন্তিম বাণীর মধ্যে কয়েকবার এসেছে জগন্মাতার শ্রীচরণে আত্মবলিদানের কথা :

''সব কিছু হারিয়ে দিয়েই,—সব পাওয়া যায়। নিজে নিজেকে পূর্ণরূপে মেরে ফেলতে পারার পরই জীবন প্রাণ প্রাপ্ত করা সম্ভব; তার আগে নয়। যখন, সবকিছু—সর্বস্ব দিয়ে লুটিয়ে দিয়ে—সত্যসত্যই রিক্ত—সর্বহারা—নিঃস্ব হওয়া যায়, তারপরই সব ভরে ওঠে, পূর্ণ হোয়ে যায়। নিজেরই ভিতর থেকে—নিজেকে এক্কেবারে খালি করে দেবার পরই,—তার পূর্ব মুহূর্তে নয়,—সেই রিক্ত-শূন্য স্থানটি পূর্ণ কোরে বসেন ঁমা জননী স্বয়ং। এই সত্য, এই তত্ত্ব, এই তথ্য, এই ঘটনা, আমার জীবন দিয়েই জেনেছি, পেয়েছি, দেখেছি—প্রত্যক্ষ কোরেছি।

''মনে রেখো—'আদর্শ' কথার অর্থ কি? 'আদর্শ' মানে 'ফাঁসি'। এটি আমার নিজের দৃঢ় জ্ঞান। 'ফাঁসি' মানুষের কাছে কি চায়। কি নেয়? প্রাণ। 'আদর্শ'ও চায়, তার সাধকব্রতীর (আদর্শব্রতী, আদর্শের সাধক, আদর্শের অনুগামী-ব্রতী) কাছ থেকে—তার সর্বস্ব—এবং দরকার পড়লে প্রাণও।

''দেশ মাতৃকা—জননী জন্মভূমির সেবা করতে হলে দিতে হবে—'মান, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, গৌরব, ইন্দ্রিয়ের সব বৃত্তি, ভাবনা, চিন্তা, ইচ্ছা এবং সবশেষে আত্মাকে।' এ না হলে মাতৃসাধনা হবে না। নিজেকে কেটে দুখানা করতে হবে—না করতে পারলে তুমি মাতৃসাধক নও। নিজেকে কেটে দুখানা করেই যদি দিতে হলো তবে আর বিবেক কোথায় থাকলো। ঁমা তাঁর নিজের কাজের জন্য বাঁচিয়ে রাখবে[ন]—কাজ সম্পন্ন করবে[ন] ঁমা-ই।''[৩০]

মায়ের রাতুলচরণে প্রণাম জানিয়ে মহান মাতৃসাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র চিরকালের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। সেদিন ছিল ১৮ আগস্ট ১৯৪৫। এর মাত্র দুবছর পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনের অবসান হল। নেতাজীর মাতৃপূজা সার্থক হল।

সবশেষে স্মরণ করি নেতাজীর প্রতি রসময়বাবুর শ্রদ্ধার্ঘ্য : ''মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্রের নেতাজীর ভূমিকায় উত্তরণের যে ইতিহাস বাস্তবিকই তা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। অবহেলিত পরাধীন ভারতের একজন জননেতা কিভাবে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ইউরোপ এবং কিভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে পশ্চাতে রেখে প্রবেশ করেছিলেন ভারতে [সেকথা] ভাবতেই বিস্ময় জাগায়। এর কোন তুলনা নেই পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে। এ যেন অঘটন [ঘটন] পটীয়সী ঐশী শক্তির দুর্বার গতিবেগ।

''নিঃশেষে যিনি সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন মায়ের চরণে, [সেই] অভয়া মা যে আজও ধরে রেখেছেন তাঁকে।... জয় [সেই] মাতৃসাধকের। জয়তু নেতাজী।''[৩১] ✠

তথ্যসূত্র

১। কিশোর সুভাষচন্দ্র বিজ্ঞের মতো বলছেন, 'জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে!' তাঁদের পরিবারিক পূজায় 'বেশী জাঁকজমক' হত, কিন্তু তার মধ্যে 'ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প'-এর অভাব রয়ে যেত, এমন কথাই কি তিনি বলতে চাইছেন? আমাদের তা মনে হয় না। লক্ষণীয়, সুভাষচন্দ্র কিন্তু পূজার আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখতে বলছেন না। বস্তুত, তাঁর চিঠির বাকি অংশে আমরা কিন্তু শাস্ত্রবিহিত ঔপচারিক পূজার ভক্তিপূর্ণ বর্ণনাই পাচ্ছি। হয়তো কখনও কখনও তাঁদের পূজায় কিছু বাহ্যাড়ম্বরের প্রদর্শনী হয়েছিল যেটা সেদিন কিশোর সুভাষের মনঃপূত হয়নি। সেই সময়ে তিনি হয়তো তাঁর অসন্তোষের কথা গুরুজনদের কাছে বলতে পারেননি। এখন মাকে চিঠি লেখার অবকাশে সেই মনোভাব প্রকাশ করলেন। মনে হয়,

অকালবৃদ্ধ পুত্রের পত্র পড়ে প্রভাবতী দেবী মুখ টিপে হেসেছিলেন।

২। সুভাষচন্দ্র বসু, *পত্রাবলী* ১৯১২-১৯৩২, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্, কলকাতা : ১৯৬০, পৃঃ ১, ২ [এরপর, *পত্রাবলী*]

৩। নিমাইসাধন বসু, *দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র : এক ঐতিহাসিক কিংবদন্তি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা : ২০১৭, পৃঃ ৭০-৭১

৪। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, *নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা : ১৩৭৪, খণ্ড ২, পৃঃ ২ [এরপর, *নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ*]

৫। সুভাষচন্দ্র বসু, *তরুণের আহ্বান*, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা : ২০০৮, পৃঃ ২ [এরপর, *তরুণের আহ্বান*]

৬। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৮ সালে অখণ্ড বাংলার (Presidency of Bengal) জন্য এই আইনটি প্রণয়ন করেছিল (পরে অবশ্য অনুরূপ আইন মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও চালু করা হয়)। এর পোশাকি নাম The Bengal State Prisoners Regulations Act III of 1818, সংক্ষেপে The Bengal Regulation Act III of 1818, চলতি নাম 'তিন আইন'। এর ফলে প্রশাসন যে-কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহ করলে বিনা প্রমাণেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবন্দি করে রাখতে পারত। তখন অবশ্য তাদের ঢক্কানিনাদিত ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের (British justice) কথা তারা মনেও রাখত না!

৭। সুভাষচন্দ্র বসু, *সমগ্র রচনাবলী*, খণ্ড ৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৯ [এরপর, *সমগ্র রচনাবলী*]

৮। *পত্রাবলী*, পৃঃ ১৭২-৩

৯। তদেব, পৃঃ ১৯১

১০। *সমগ্র রচনাবলী*, খণ্ড ২, ২০১৮, পৃঃ ৮০

১১। তদেব, খণ্ড ৩, পৃঃ ৮৯-৯২

১২। তদেব, খণ্ড ৪, পৃঃ ২৭

১৩। 'পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা' কীভাবে করা যায়, তার একটা ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি তরুণ সুভাষের লেখা চিঠি থেকে (যা এই প্রবন্ধের প্রথমেই অংশত উদ্ধৃত হয়েছে)।

১৪। *পত্রাবলী*, পৃঃ ২১৭-১৮

১৫। *সমগ্র রচনাবলী*, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩০

১৬। তদেব, পৃঃ ১৩২

১৭। *তরুণের আহ্বান*, পৃঃ ১৩৪

১৮। *সমগ্র রচনাবলী*, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৬

১৯। প্রণবেশ চক্রবর্তী, প্রবন্ধ : দেবী-আরাধনা ও সুভাষচন্দ্র, *উদ্বোধন*, আশ্বিন ১৪০৩, পৃঃ ৪৯৯

২০। তদেব

২১। সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত, *সুভাষচন্দ্রের কলকাতা*, পাতাবাহার, কলকাতা, ২০২১, পৃঃ ১৩৮-১৫০

২২। ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, *নেতাজীর মা*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা : ২০২১, পৃঃ ১৪৫-৬

২৩। সুনীল দাস (প্রধান সম্পাদক), *সুভাষ-রচনাবলী*, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা : ১৯৮৩, খণ্ড ৫, পৃঃ ২১৭-৮

২৪। *নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ*, খণ্ড ২, পৃঃ ৮৮-৯

২৫। *সমগ্র রচনাবলী*, খণ্ড ৯, ২০১৯, পৃঃ ১৬৪-৫

২৬। *নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ*, খণ্ড ২, পৃঃ ৮৯

২৭। তদেব, পৃঃ ৯০-৯৬

২৮। রসময় শূর, প্রবন্ধ : 'মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্র', *স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র*, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিবেকানন্দ পাঠাগার, কলকাতা : ১৯৭০, পৃঃ ৮২-৮৪

২৯। এর বছরখানেক পরেই তিনি বার্লিনে ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টার স্থাপন করেন (২ নভেম্বর ১৯৪১)। সেটি ছিল তাঁর প্রথম কার্যালয়। সেখানকার ভারতীয় সদস্যগণ তাঁকে 'নেতাজী' আখ্যা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে বিশ্ব তাঁকে চিনবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ 'নেতাজী' নামে।

৩০। সম্পাদনা : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পবিত্রমোহন রায়, *নেতাজী'র সিক্রেট সার্ভিস*, প্রান্তিক, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ পরিশিষ্ট (iii)-(iv)

৩১। *স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র*, পৃঃ ৮২-৮৪